ভূমিকা

"যাকে সীমায় বাঁধতে পারি তার সংজ্ঞানির্ণয় চলে ; কিন্তু যা সীমার বাইরে, যাকে ধরে ছুঁয়ে পাওয়া যায় না, তাকে বুদ্ধি দিয়ে পাই নে, বোধের মধ্যে পাই। উপনিষদ্ ব্রহ্ম সম্বন্ধে বলেছেন, তাঁকে না পাই মনে, না পাই বচনে ; তাঁকে যখন পাই আনন্দবোধে তখন আর ভাবনা থাকে না। আমাদের এই বোধের ক্ষুধা আত্মার ক্ষুধা। সে এই বোধের দ্বারা আপনাকে জানে। যে প্রেমে, যে ধ্যানে, যে দর্শনে কেবলমাত্র এই বোধের ক্ষুধা মেটে তাই স্থান পায় সাহিত্যে রূপকলায়।"[১]

সাহিত্য সৃষ্টি লগ্ন থেকেই বিচিত্র রূপে পাঠকমহলকে প্রতিনিয়ত অভিভূত করে চলেছে। সে তার দেহে কালের ব্যবধানে ধারণ করেছে বিচিত্র শাখা-প্রশাখা। বিশ্বপ্রকৃতির অপার রহস্য প্রতিটি শাখায় সৃজনশীল হাতে মুক্তি দিয়েছে নতুন বিষয়, নতুন ভাবনাকে। সময় ব্যতীত সাহিত্য সৃষ্টি অসম্ভব। সময়ের মন্থনেই শিল্পের জন্ম হয়। দেশকালের বাতাবরণ এবং ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাই মস্তিষ্কচালিত মানুষের ভাবনা, দর্শন এবং কর্মকাণ্ডে মননশীলতার প্রকাশ ঘটে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীর আদি সাহিত্য কাব্য তার পথে পেয়েছে গদ্য সাহিত্যের নানা রূপকে। একে একে এসেছে নাটক, উপন্যাস, ছোটোগল্প, অনুগল্পের মতো সাহিত্য। বাংলা সাহিত্য তার পথ চলার ধারাবাহিকতায় বহু বিচিত্র নিদর্শন তৈরি করেছে। প্রাচীন ও মধ্যযুগের কাব্যচর্চার বাতাবরণ থেকে বেরিয়ে এসে উনিশ শতকে বাংলা সাহিত্য গদ্য সাহিত্যে পদার্পণ করে। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠার পর থেকে বাংলা গদ্যচর্চার সার্থক সূত্রপাত হয়। গদ্যসাহিত্যের সূচনা পর্ব থেকে নাটক, প্রবন্ধ, ছোটগল্পের আস্বাদ আমরা পেতে শুরু করলেও উনিশ শতকের দ্বিতীয় পর্বে সার্থক বাংলা উপন্যাসের আবির্ভাব হয়।

বাংলা সাহিত্যে উনিশ শতক এক যুগান্তর সৃষ্টিকারী শতক। কারণ এ সময়ে সাহিত্যের নতুন নতুন শাখার জন্ম নিয়েছে। আর প্রতিটি শাখাই এক অভিনব রূপ নিয়ে নিজেদের বৈচিত্রকে প্রকাশ করেছে। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য উপন্যাস সাহিত্যের প্রধান আধার। উনিশ শতকের পাশ্চাত্য নবজাগরণের ফলে বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের যাত্রা শুরু হয়। প্রতিটি শাখার মধ্যে উপন্যাস সাহিত্যের শাখা মানব জীবনের বহু বিচিত্র ভাবনাকে প্রকাশ

করতে করতে প্রথম থেকেই পাঠক মনে তার চিরস্থায়ী জায়গা করে নিয়েছে। তবে উপন্যাস নাম নিয়ে যে অভিনব শাখা পাঠক মহলে বিস্ময়ের সঞ্চার করেছিল তা একদিনে হয়নি। ভিতরে ভিতরে তার প্রস্তুতিপর্ব ছিল বহুদিনের। প্যারিচাঁদ মিত্র 'আলালের ঘরের দুলাল' (১৮৫৮ খ্রিঃ)–এ চেষ্টা করেছেন বাংলা উপন্যাস সাহিত্যকে একটি অন্যতর রূপ দিতে। কিন্তু ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধের প্রকৃত রূপ সে সময়ের সমাজে সেভাবে দেখা যায়নি বলে উপন্যাসটি তার সার্থকতার মর্যাদা লাভ করতে পারেনি। এই বিস্তৃতি পর্বকে পরিপূর্ণ রূপ দিলেন সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। ঐতিহাসিকতা, সামাজিকতা এবং রোমান্সকে অবলম্বন করে বাংলা উপন্যাস তার প্রাথমিক পথ চলা শুরু করেছিল। কিছুকাল পরে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পরিমণ্ডলের সঙ্গে সঙ্গে মনস্তত্ত্বও বাংলা উপন্যাসে স্বমহিমায় নিজের জায়গা দখল করে নিয়েছে। উপন্যাসের পূর্বসূত্র বহুকাল পূর্বে বিভিন্ন সাহিত্যের মধ্যে প্রচ্ছন্নভাবে সূচিত হলেও বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'দুর্গেশনন্দিনী' (১৯৬৫ খ্রিঃ) উপন্যাসের মধ্য দিয়ে তাঁর সৃজনীশক্তির নিদর্শন উপস্থাপন করলেন। পরবর্তী সময়ে 'বিষবৃক্ষ' (১৮৭৩ খ্রিঃ), 'কৃষ্ণকান্তের উইল' (১৮৭৮ খ্রিঃ) উপন্যাসে সামাজিক নীতিবোধের উচ্চস্তরের উদ্দেশ্যমূলকতার পরিচয় পাওয়া যায়। 'রাজসিংহ' (১৮৮২ খ্রিঃ), 'আনন্দমঠ' (১৮৮২ খ্রিঃ), 'সীতারাম' (১৮৮৭ খ্রিঃ) উপন্যাসের মধ্যে রাজনৈতিক ও ঐতিহাসিকতা পরিসর তাঁকে যথেষ্ট সমাদৃত করেছে। সমগ্র উনিশ শতক জুড়ে বাংলা উপন্যাসে দেশাত্মবোধ এবং সমাজ সমস্যার প্রভাব পড়তে দেখা যায়। বঙ্কিমচন্দ্র এবং তাঁর ভাবশিষ্যরা সে পথকেই অনুসরণ করেছিলেন। বাংলা সার্থক উপন্যাস রচনার পর বাংলা উপন্যাস জগতে রবীন্দ্রনাথের হাতে এলো এক নতুন আদর্শের সূচনা। রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস সম্পর্কে শ্রী শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন—

> *"বঙ্কিমচন্দ্রের পর বাংলা উপন্যাসের অগ্রগতি যখন রুদ্ধপ্রায় হইয়াছিল, তখন রবীন্দ্রনাথই তাহার জন্য নূতন পথ উন্মুক্ত করিয়াছেন। তাঁহার অসাধারণ প্রতিভা যাহা স্পর্শ করিয়াছে তাহাই দ্যুতিমান হইয়া উঠিয়াছে এবং উপন্যাসের উপর তাঁহার প্রভাবের যে ছাপ পড়িয়াছে তাহা মুছিবার নহে। আধুনিক বঙ্গ-উপন্যাস তাঁহার প্রদর্শিত পথে চলিয়াছে।"*[২]

বাংলা উপন্যাস ধারায় নবতর আঙ্গিকে এক ভিন্ন যুগের নির্মাণ করলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'চোখের বালি' (১৯০৩ খ্রিঃ) উপন্যাসের মধ্য দিয়ে। 'গোরা' (১৯১০ খ্রিঃ), 'চতুরঙ্গ' (১৯১৬ খ্রিঃ), 'ঘরে বাইরে' (১৯১৬ খ্রিঃ), 'যোগাযোগ' (১৯২৯ খ্রিঃ), 'শেষের কবিতা' (১৯২৯ খ্রিঃ)

উপন্যাসের মধ্য দিয়ে তিনি উপন্যাস জগতে নিজস্ব পরিচয় নির্মাণ করলেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কথাসাহিত্যে তৎকালীন সমাজ কথিত সাধারণ জনতার কথা অনুপস্থিত ছিল। সেই অভাব পূরণের দায়িত্ব নিয়েছিলেন শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। তাঁর 'পল্লীসমাজ' (১৯১৬ খ্রিঃ), 'শ্রীকান্ত' (১ম পর্ব- ১৯১৭ খ্রিঃ, ২য় পর্ব- ১৯১৮ খ্রিঃ, ৩য় পর্ব- ১৯২৭ খ্রিঃ, ৪র্থ পর্ব- ১৯৩৩ খ্রিঃ), 'দেবদাস' (১৯১৭ খ্রিঃ), 'পথের দাবী' (১৯২৬ খ্রিঃ) প্রতিটি উপন্যাসের জনপ্রিয়তা তাঁকে বাংলা উপন্যাস জগতে জনপ্রিয় করে তোলে। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁর রচনা শৈলীতে বাংলা উপন্যাসের বিশ শতকের প্রথম দুই দশকের সামাজিক ও অর্থনৈতিক পটভূমিকে নিপুণভাবে প্রস্ফুটিত করেছিলেন। প্রায় সমসাময়িক কালের বিচরণ ভূমিতে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, অনুপমা দেবী, সীতা দেবী প্রমুখ সাহিত্যিকরা উঠে এলেন। তাঁদের উপন্যাসের মধ্যে পারিবারিক চিত্রের সঙ্গে সঙ্গে নারী-পুরুষের চিরাচরিত আদর্শের উচিত-অনুচিত বোধ দিয়ে দেখা জগতকে লেখার মধ্যে ধরে রাখার চেষ্টা করলেন।

বাংলা সাহিত্যের অন্যান্য শাখার মতোই উপন্যাস সাহিত্যে বিশ শতকের 'কল্লোলযুগ' ব্যাপকভাবে প্রভাব বিস্তার করেছিল। এযুগে চিরাচরিত ভারতীয় আদর্শের মনোভাবের বিরুদ্ধে গিয়ে প্রেমেন্দ্র মিত্র, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় প্রমুখরা উঠে এলেন। এই সময় সৃষ্টি হল 'পাঁক' (১৯২৭ খ্রিঃ), 'বেদে' (১৯২৮ খ্রিঃ), 'কয়লাকুঠির দেশ' (১৯৫৮ খ্রিঃ)–এর মত উপন্যাস। বিশ শতকের তৃতীয় দশক বাংলা উপন্যাসের জগতে নিয়ে এল বিচিত্র রূপ। এ যুগের সূচনা পর্বে ১৯২৯ সালে প্রকাশিত বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পথের পাঁচালী' উপন্যাস সেই নতুন পথকে অভ্যর্থনা জানাল। এরপর জগদীশ গুপ্তের 'লঘুগুরু' (১৯৩১ খ্রিঃ), তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'চৈতালীঘূর্ণি' (১৯৩১ খ্রিঃ), অন্নদাশঙ্কর রায়ের 'সত্যাসত্য' (১৯৩৫ খ্রিঃ) প্রকাশিত হয়। ফলে ১৯২৯-১৯৩৫ সালের মধ্যে লিখিত উপন্যাসে উঠে এসেছে বিচিত্র বিষয়বস্তু।

বিশ শতকের ত্রিশের দশকের প্রথাবিরোধী নতুন রীতির সূচনা এই সময় পর্বে উপন্যাসের দৃষ্টিকোণকে বদলে দিয়েছিল। চল্লিশের কালপর্ব ভারতীয় জনজীবনে গুরুত্বপূর্ণ সময়। পরপর বহু আন্দোলন ভারতীয় জনমানসে তরঙ্গের সৃষ্টি করেছিল। সামাজিক-অর্থনৈতিক মন্দার বশবর্তী হয়ে সর্বহারার দলে পরিণত হয় সাধারণ জনসমাজ। বহু আন্দোলন, রক্তক্ষয়ের পর আসে 'স্বাধীনতা' নামের মূল্যবান অধিকার। স্বাধীনতার পরেও রাজনৈতিক কারণে বহু সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় সমাজকে। সামাজিক-রাজনৈতিক

পরিবর্তনের ছায়া উঠে আসে তারাশঙ্কর বন্দোপাধ্যায়ের—'ধাত্রীদেবতা' (১৯৩৯ খ্রিঃ), 'গণদেবতা' (১৯৪২ খ্রিঃ), নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের—'উপনিবেশ' (১৯৪৪ খ্রিঃ), সুবোধ ঘোষের—'তিলাঞ্জলি' (১৯৪৪ খ্রিঃ), সতীনাথ ভাদুড়ীর—'জাগরী' (১৯৪৫ খ্রিঃ), 'ঢোঁড়াইচরিতমানস' (১৯৪৯ খ্রিঃ), বুদ্ধদেব বসুর—'তিথিডোর' (১৯৪৯ খ্রিঃ) প্রভৃতি উপন্যাস গুলির মধ্যে। চল্লিশের দশকের মন্বন্তরের প্রেক্ষাপট উঠে এসেছে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের—'অশনি সংকেত' (১৯৫৯ খ্রিঃ), গোপাল হালদারের—'পঞ্চাশের পথ' (১৯৪৪ খ্রিঃ), 'তেরশ পঞ্চাশ' (১৯৪৫ খ্রিঃ), 'ঊনপঞ্চাশী' (১৯৪৬ খ্রিঃ) ইত্যাদি উপন্যাস। দেশভাগ, দাঙ্গা, উদ্বাস্তু সমস্যা বাংলা উপন্যাসের আর এক মোড়বদল। চল্লিশের দশকেই উঠে আসা কিছু নারী ঔপন্যাসিক নিজেদের কথাবয়নে অভিনবত্বের পরিচয় রেখেছেন। তাঁদের মধ্যে জ্যোতির্ময়ী দেবী, আশাপূর্ণা দেবী, মহাশ্বেতা দেবী, কবিতা সিংহ, প্রতিভা বসু, লীলা মজুমদার উল্লেখযোগ্য। এই লেখিকাদের হাতে যেমন বাঙালি নারীদের প্রগতিশীলতার কথা ফুটে উঠেছে, তেমন ভাবেই ফুটে উঠেছে নারীর অন্দরমহলের কথা।

বিশ শতকের ষাট-সত্তর দশক ব্যাপক রাজনৈতিক চাপান-উতর ঘটে। এই সময়ের খাদ্য আন্দোলন, নকশালবাড়ি আন্দোলন, শিল্পায়নের দ্রুত প্রসার, বাঙালি জীবনের পূর্বতর আদর্শ বদল—সমগ্র বিষয়ই বাংলা উপন্যাসের চলমানতাকে নিয়ন্ত্রণ করেছে। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, সমরেশ বসু, রমাপদ চৌধুরী, অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়, সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ প্রমুখ ঔপন্যাসিকদের কিছু কিছু উপন্যাসে সমকালীন ভারতবর্ষের চাঞ্চল্য, বিক্ষোভ ও পৃথিবী ব্যাপী অসন্তোষ-বিদ্রোহের প্রতীকী চিত্র ধরা পরে। আশি-নব্বইয়ের দশকে বাংলা উপন্যাসে নতুনতর অধ্যায়ের সূচনা হয়। প্রাচীন বিশ্বাসকে ভেঙে নতুনের সংযোগে বাংলা উপন্যাসের মোড় বদল ঘটে। প্রফুল্ল রায়ের—'আকাশের নীচে মানুষ' (১৯৮১ খ্রিঃ), সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের— 'পূর্বপশ্চিম' (১ম খন্ড ১৯৮৮ খ্রিঃ, ২য় খন্ড ১৯৮৯ খ্রিঃ), আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের—'চিলেকোঠার সেপাই' (১৯৯৩ খ্রিঃ), শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের—'মানবজমিন' (১৯৮৮ খ্রিঃ), অভিজিৎ সেনের—'রহু চণ্ডালের হাড়' (১৯৮৫ খ্রিঃ), বুদ্ধদেব গুহর—'একটু উষ্ণতার জন্য' (১৯৮৬ খ্রিঃ), উপন্যাসগুলিতে পূর্বাপর উপন্যাসের রীতিতে পা না বাড়িয়ে ঔপন্যাসিকেরা নতুন দৃষ্টিকোণ যোগ করলেন। এই সময়পর্বে সুচিত্রা ভট্টাচার্য, বাণী বসু, রামকুমার মুখোপাধ্যায়, আবুল বাশার, ভগীরথ মিশ্র, আফসার আহমেদ, নলিনী বেরা, স্বপ্নময় চক্রবর্তী, কিন্নর রায়ের মত ঔপন্যাসিকেরা উঠে এলেন।

সত্তর দশকের শেষ লগ্ন থেকেই কিন্নর রায়ের পথ চলা শুরু। গল্প সাহিত্যের মধ্য দিয়ে তিনি প্রথম থেকেই বিশিষ্ট পরিচয় আদায় করেছেন। ছোটোগল্প ব্যতীত দ্বিতীয় উপন্যাসের মধ্য দিয়ে তাঁর লেখনী শক্তির পরিচয় পাঠক পেয়েছে। সাহিত্য জগতে তিনি অবদান রেখে চলেছেন গল্প, প্রবন্ধ, রম্য রচনা, উপন্যাস সাহিত্যের মধ্য দিয়ে। কোনরকম প্রতিষ্ঠানের তাবেদারী ছাড়াই কিন্নর রায় তাঁর সাহিত্য জগতকে অন্যমাত্রা দিয়েছেন। একজন সক্রিয় নকশালকর্মী হওয়ার সুবাদে শাসকবর্গের বহু আক্রমণের শিকার হয়েও জীবনের অভিজ্ঞতাকে লেখনীর মধ্য দিয়ে প্রকাশ করে চলেছেন নির্দ্বিধায়। সেইসঙ্গে প্রথম জীবনের সাংবাদিকতার পেশা তাঁর অভিজ্ঞতাকে পরিপূর্ণতা দিয়েছে। এছাড়া রাজনৈতিক কাজের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার কারণে রাজনীতি বিষয়ক বইপত্রের জ্ঞান তাঁর মধ্যে যথেষ্টই ছিল। সেই সূত্রকেই কাজে লাগালেন তাঁর রচিত প্রথম পর্বের সাহিত্যে। জীবনে বহু জায়গায় ভ্রমণ করেছেন সেইসব অভিজ্ঞতাও তাঁর সাহিত্যে স্থান করে নিয়েছে। রাজনীতির সূত্রে জেলজীবনও তাঁর ভাগ্যে জুটেছে। সেখানে বসেই লিখে ফেলেছেন প্রথম উপন্যাস 'কাছেই নরক' (১৯৮১ খ্রিঃ)। যে সময়পর্বে দাঁড়িয়ে অন্যান্য ঔপন্যাসিকেরা উপন্যাসের বিষয়বস্তু নির্বাচনে চমক দেওয়ার চেষ্টা করেছেন সেখানে দাঁড়িয়ে কিন্নর রায় বেছে নিলেন প্রতিবাদের ভাষা। লিপিবদ্ধ করলেন প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা। মননশীল দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে রচনা করলেন পরিবেশ বিপর্যয়ের রূপকে। সেইসঙ্গে উঠে এল ধর্ম ও সাম্প্রদায়িকতা। কিন্নর রায় কীভাবে একজন সমাজ গবেষকের ভূমিকা পালন করে দীর্ঘ সময়ের সামাজিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয় ও সাম্প্রদায়িক ইতিহাসকে বুনতে গিয়ে বহুমুখী জীবনসত্তা তুলে ধরেছেন সেই বিষয়টি অনুধাবনই আমার গবেষণা প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য।

কিন্নর রায় রচিত উপন্যাসগুলির মধ্যে ১৯৮১ সাল থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত প্রকাশিত ২৩টি উপন্যাস নিয়ে আমি আলোচনায় অগ্রসর হয়েছি। উপন্যাসগুলির মধ্যে ঔপন্যাসিক বিভিন্ন সময়ের প্রেক্ষাপটে ভিন্ন জীবনদর্শনকে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। আলোচ্য গবেষণা কর্মে একই জায়গায় দাঁড়িয়ে একই চরিত্রের কিংবা চরিত্রভেদে বহুমুখী জীবনের স্বরূপকে আমি নিম্নলিখিত অধ্যায়ে বিভাজন করেছি—

প্রথম অধ্যায় : কিন্নর রায়ের জীবন ও সাহিত্য পরিচয়

দ্বিতীয় অধ্যায় : কিন্নর রায়ের উপন্যাসের প্রাথমিক পরিচয় ও বিষয়ভিত্তিক শ্রেণিকরণ

তৃতীয় অধ্যায় : কিন্নর রায়ের প্রকৃতিচেতনামূলক উপন্যাসে বহুমুখী জীবনসত্তার অনুসন্ধান

চতুর্থ অধ্যায় : কিন্নর রায়ের ধর্মচিন্তামূলক উপন্যাসে বহুমুখী জীবনসত্তার অনুসন্ধান

পঞ্চম অধ্যায় : কিন্নর রায়ের রাজনৈতিক চেতনামূলক উপন্যাসে বহুমুখী জীবনসত্তার অনুসন্ধান

ষষ্ঠ অধ্যায় : কিন্নররায়ের আর্থ-সামাজিক ভাবনামূলক উপন্যাসে বহুমুখী জীবনসত্তার অনুসন্ধান

আমার গবেষণা কর্মে উক্ত অধ্যায়গুলির শিরোনামের দিকে লক্ষ রেখে ঔপন্যাসিক কিন্নর রায়ের ঔপন্যাসিক সত্তার অনুসন্ধানে অগ্রসর হয়েছি। এই গবেষণা কর্মের দ্বারা বাংলা উপন্যাস জগতে তিনি যে আলাদা মাত্রা যোগ করেছেন সেই বিষয়টিও স্পষ্ট হবে বলে মনে করি। ঔপন্যাসিক কিন্নর রায় মানব চরিত্রের যে বহুমুখী জীবনসত্তার অনুসন্ধান করেছেন তা পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে তুলে ধরবার চেষ্টা করব।

তথ্যসূত্র

১। ‘সাহিত্যধর্ম’, ‘সাহিত্যের পথে’, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বভারতী, ৬ আচার্য জগদীশ চন্দ্র বসু রোড, কলকাতা-১৭, প্রথম প্রকাশ, আশ্বিন ১৩৪৩, পুনর্মুদ্রণ, আশ্বিন ১৪১৪, পৃ-৭৪।

২। ‘বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা’, শ্রী শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, ১০ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, পুনর্মুদ্রণ, ২০১১-২০১২, প্রথম প্রকাশ, ১৩৪৫ বঙ্গাব্দ, পৃ-১০৮।